ভাষার প্রাণচিহ্ন

মনোজকুমার দ. গরিশি

বাংলা ভাষায় শব্দ সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। এর পরিমাণ একটু করে দিনে দিনে বাড়ছে। অন্যভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করা হচ্ছে, কিংবা চেষ্টাকৃতভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দ তৈরি করা হচ্ছে, নতুন নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করা হচ্ছে, কোনও বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে নতুন নতুন শব্দ নির্মাণ করতে হচ্ছে ----এ সকল কারণে বাংলা ভাষায় শব্দ সংখ্যা বাড়ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা, আবিস্কার, অভিযান, নানা গবেষণা, রাজনীতি, সমাজনীতি সেবা, বাণিজ্য ও বহিঃযোগাযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপক চর্চা, এবং যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবনভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ---এসব কারণেও ভাষায় শব্দ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যে-জাতি এ সকল বিষয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় বা হতে বাধ্য হয় তাদের ভাষায় এ সকল বিষয়ের প্রক্রিয়ায় শব্দ সৃষ্টি ও আমদানি হয়।

ইংরেজিতে শব্দ সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লাখ। ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল সারা পৃথিবী জুড়ে।বাণিজ্য এবং অভিযানে ইংরেজিভাষীরা ছিল প্রথম সারিতে। --- কথায় বলা হয় যে, ইংরেজি হল ল্যাংগোয়েজ অব ট্রেড, সুতরাং এসবের প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজির মধ্যে হাজার হাজার শব্দ তৈরি হয়েছে বা তার ভাণ্ডারে জমা পড়েছে। ইংরেজি অভিধানে দেশ বিদেশের নানা ভাষার শব্দ জমা হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলা শব্দও সেখানে আছে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার শব্দও আছে সেখানে। প্যান্ডেল শব্দটি শুনে ইংরেজি বলে মনে হতেপারে, আসলে এটি হল একটি দক্ষিণ ভারতীয় শব্দ (তামিল - মালয়ালম শব্দজাত)। বাংলা ভাষায় এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা হচ্ছে, ফলে বাংলায় এই ধরনের শব্দ - সংখ্যা একটু একটু করে বাড়ছে। তবে এই চর্চার সময়ে যে সকল টার্ম (নাম, আখ্যা) ব্যবহার করা হচ্ছে, বা তৈরি হচ্ছে, তা যত বেশি বাংলায় হবে ততেই বাংলার শব্দ সংখ্যা বাড়বে। বাঙালিরা বিজ্ঞান চর্চা করলেও ইংরেজির প্রভাবে বাংলা ভাষায় সাধারণত তা চর্চা করতেন না, ফলে বাংলা শব্দের ভাণ্ডার এতদিন সে - চর্চা দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ হয়নি।

বাংলায় যে দেড় ল(শব্দ আছে তার কতকগুলি খুব বেশি ব্যবহৃতহয়, কতকগুলি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, কতকগুলি অল্প ব্যবহৃত হয়, আর কিছু শব্দ প্রায় কখনই ব্যবহৃত হয় না। এমনকি ধর্মীয় কারণে, ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে, গোষ্ঠী ভেদে কোনও কোনও শব্দ বেশি বা কম ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে শ্রী এবং শ্রীমতী যেমন বেশি ব্যবহার করা হয়, তেমনি বাংলাদেশে জনাব শব্দটির ব্যবহার বেশি। মরহুম শব্দটি সেখানে, এবং এর সমশব্দ প্রয়াত কংবা স্বর্গীয় (কিংবা ঁ চিহ্ন) ব্যবহার করা হয় পশ্চিমবঙ্গে। আসলে এসব শব্দ ধর্মীয় শব্দ। কিন্তু পানি এবং জল নিয়ে বাংলাভাষী এই দুই অঞ্চলে বলা যায় প্রায় মানসিক বিরোধ আছে। এটিও মূলত ধর্মীয় কারণেই ঘটছে। আবার মুখে বলার সময়ে শি(িত বাঙালি বলেন, মিস্টার অমুক, এটাই আগেকার দিনে বলা হত অমুক বাবু। বাংলাদেশে সাহেব বলার রেওয়াজ আছে, আলি সাহেব, হোসেন সাহেব ইত্যাদি। অনেকে হয়তো জানেন যে, খাল বিলের দেশ পূর্ববঙ্গে নৌকায় করে যাতায়াত করার কালে পরস্পর নৌকার যাত্রীদের মধ্যে পরিচয় শু(হত এভাবে--- নৌকায় মিয়া না মশাই, কোন্‌দিকে যাওয়া হবে ।

বাংলা অভিধানে এমন শব্দও আছে যেসব শব্দ অনেকে সারাজীবনে একবারও ব্যবহার করেননি বা শোনেনওনি। যেমন---সিঙ্গালা (শুকনো বা নোনা মাছ), ধবাঙ((কাক), অনড়ান (বৃষ) ইত্যাদি। কিছু কিছু শব্দ সাময়িকভাবে চালু ছিল পরে বর্জিত হয়েছে। আবার অনেক শব্দ আছে যা এখনও অভিধানে জায়গা পায়নি। আসলে বাংলায় পূর্ণাঙ্গ অভিধান তৈরি হয়নি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -এর বঙ্গীয় শব্দকোষ এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-এর বাঙ্গালা ভাষার অভিধান সেদিক দিয়ে অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ---কিন্তু এ দুটি প্রাচীন অভিধান, তাছাড়া এসকল একক চেষ্টায় প্রস্তুত। জাতীয় অভিধান নামে বাংলায় একটি অভিধানের প্রথম খণ্ড কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে যা পূর্ণাঙ্গতার দাবি করতেপারে।

একখানি অভিধানের সকল শব্দ একজনের সারা জীবনে না লাগলেও এক-একটি শব্দের বিবিধ বানান মানুষকে বিভ্রান্ত করে। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর বাগর্থ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ..করছি.. বানানটি ১২ রকম হতেপারে। তিনি বলেছেন--- সকল কালে সকল পু(ষে এই কর্ ধাতুর রূপ সংখ্যা কত হইতেপারে তাহা দেখাইবার জন্য একটি রূপতালিকা হইল। এর পরে তিনি বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন যে, মোট ৫৩টি রূপের স্থলে তা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ৮৬২। এরকম হলে সাধারণ মানুষের প(বানান নির্ধারণ করাই কঠিন ব্যাপার। বাংলায় শ ষ স একত্রে ব্যবহার করে একটি শব্দ আছে--- সবিশেষ। এটির বানান সর্বমোট ১০৮ রকম হতে পারে। তাই বাংলায় সঠিক বানান লেখা বেশ কঠিন কাজ। হিসেব করে দেখা গেছে বাংলায় ৩১.৭৬ শতাংশ বানান ভুল হতেপারে। যদিও এত ভুল কারওই হয় না। সতর্ক সাবধান লোকের বানান ভুল খুবই কম হয়। নয়তো তিনটে হরফ লিখলে একটি যদি ভুল হত (৩১.৭৬ শতাংশ) তবে বাংলা লেখাই কঠিন হত। তবু একথা ঠিক যে, সতর্ক সাবধান হয়েও নির্ভুল বানান লেখা বিশেষ কারণে এখন আর সম্ভব হচ্ছে না।

সাধারণ মানুষ স্কুল কলেজে যা শিখে আসে তা পরে সংশোধিত এবং রীতিবদ্ধ হয় সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্রগুলি এক - একটি এক - এক-একপ্রকার বানানরীতি অনুসরণ করেন। ফলে এক-কাগজের পাঠক অন্য কাগজ পড়তে গিয়ে বানানে হোঁচট খান। অবশ্য যাঁরা বেশি সতর্ক তাঁরাই বেশি হোঁচট খান। সবাই যে কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ের প্রবর্তিত বানানের নিয়ম (১৯৩৬) অনুসরণ করেন তা নয়। এর পরে আছে বাংলাদেশের বাংলা বানান রীতির নানা পদ্ধতি। সব মিলিয়ে এমন ব্যাপার হয়েছে যে, বলা চলে যে বাংলা বানানে এক-একটি সংবাদপত্র বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বানান-ঘরানা আছে। একেই হয়তো বলা হবে---হাউস স্টাইল। কিন্তু এ হাউস - স্টাইল বা বানান - ঘরানা বাংলা ভাষার মধ্যে ব্যাপক ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করছে। ১৯৯১ - তে প্রকাশিত হয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধির পুস্তক। এতে তাঁরা বাংলা বানানকে সরল এবং একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন। আনন্দবাজারের এই পুস্তকের প্রভাব বাংলা ভাষা ও বানানে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নানা কারণে ---বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, প্রথা বা ধর্মীয় ইত্যাদি যে কারণেই হোক, সবাই তা মানেননি। এসব কারণের বাইরেও কেউ কেউমনে করেছেন যে, কোনও কোনও শব্দে যেভাবে বানান গঠন করা হয়েছে তা সঠিক নয়। ফলে আনন্দবাজারের পাঠক গণশক্তি(পড়লে অন্যরকম বানান পাবেন। তাই কোনও পাঠক গণশক্তি(কে তাঁর মতামত জানাতে গেলে যে - বানানে চিঠি লিখবেন, আনন্দবাজারে পাঠালে তা থেকে অনেক ভিন্ন বানানে চিঠি লিখবেন। যদি ও তার কোন্‌টা ভুল, কোন্‌টা ঠিক কো তা নির্ধারণ করবেন ঞ তাই ঘরানা অনুযায়ী বাংলা বানান লিখতে হবে। এছাড়া আছে পঃ বঙ্গ বাংলা আকাদেমি, বি(েভারতী, ঢাকার বাংলা একাদেমী, এবং অন্য নানা মান্য প্রতিষ্ঠান। কার কথায় পাঠক বা লেখক চলবেন ঞ এ যেন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের মতো যখন যে দলে কেউ থাকবেন সেই আদর্শ মেনে তাকে চলতে হবে। কিংবা তা হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ ধর্মের ভিন্ন প্রে(িতের মতো কিংবা ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ক্লাব - মর্যাদার লড়াইয়ের মতো ব্যাপার। যাঁরা বানান সুষ্ঠু এবং সংগঠিত করার জন্য এ সকল পুস্তক প্রণয়ন করেছেন ও উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁর একান্তভাবে বাংলাভাষার মঙ্গল কামনাতেই তা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তা বাংলাভাষী মানুষের একাংশের প্রয়াস তাই তা শেষ অবধি বাংলাভাষার মঙ্গল করতেপারেনি। কারণ তা পারা সম্ভব নয়। তাছাড়া, এই বানান সংস্কারের পিছনে সঠিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা বি(েষণ নেই। বলা যায় এ সকল সংস্কার অনুমানের উপর নির্ভর করে করা হাতুড়ে সংস্কার। এটা হলে ভালো হয় --- এমনি মনোভাবের প্রতিফলন বাংলা বানান সংস্কারের সর্বত্র।এটা কেন করা হবে তার বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবনা চিন্তা নেই। তাই অনুমাননির্ভর এই সংস্কার আসলে বানান সংস্কার নয়। ও - ভাবে না লিখে এইভাবে লেখা হবে --- কার্যত এই পর্যায়ে পড়ে আছে তা।

বাংলা বর্ণমালার সজ্জা কেমন হবে তা নিয়েও তো আছে দ্বিধা বা মতপার্থক্য। অ আ ক খ করে যেভাবে আমরা বর্ণমালা পড়ি ভাষা - বিজ্ঞানীরা ঠিক কীভাবে হবে তা নিয়েও তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস গ্রন্থে কৃষ(পদ গোস্বামী বাংলা বর্ণমালা সাজিয়েছেন--- প ব ম ব (অন্তঃস্থ) ফ ভ ত থ দ ধ ন স ল র ট ঠ ড ঢ য ড় ঢ় য চ ছ জ ঝ শ ক খ গ ঘ ঙ ঃ হ।
বাংলাভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু সাজিয়েছেন --প ফ ব ভ ম ব (অন্তঃস্থ) ত থ দ ধ ন স র ল চ ছ জ ঝ শ য় ট ঠ ড ঢ ড় ঢ় ক খ গ ঘ ঙ হ।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর দি ওরিজিন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেংগলি লব্যাংগোয়েজ গ্রন্থে সাজিয়েছেন --- হ ক খ গ ঘ ঙ ট ঠ ড ঢ ড় য় চ ছ জ ঝ শ ন ল র স ত থ দ ধ প ফ ব ভ ম।
উচ্চারণস্থানে ধারাবাহিকতা অনুসারে বাংলা বর্ণমালার সজ্জা বিহিত করলে সুনীতিকুমারের করা সজ্জাই প্রায় সবটা গ্রহণীর অর্থৎ বাংলা বর্ণমালার সজ্জা হবে ঃ---
হ
ক খ গ ঘ ঙ
য়
ট ঠ ড ঢ ড় ঢ়
চ ছ জ ঝ শ
ন র ল স
ত থ দ ধ
প ফ ব ভ ম - ৩১
এছাড়া আরও চারটি বিকল্প বর্ণ আছে----
ঃ ং ৎ অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ সর্বমোট ৩৫টি। স্বরবর্ণ হবে মোট সাতটি এবং তাদের নতুন সজ্জা হবে--- (উচ্চারণ স্থানের ত্র(ম অনুসরণ করে)-- উ ও অ আ এ্যা এ ই - ৭।
সুতরাং বাংলা নতুন বর্ণমালায় থাকবে --- ৭ যোগ ৩৫ মোট ৪২টি বর্ন।
উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলা বর্ণমালার সজ্জা এবং মৌলিক স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ বিষয়ে পণ্ডিতেরা উদার আলোচনাকরলেও বাংলা বানানে উচ্চারণমূলক রীতি গ্রহণে সম্মতি দেননি। বরং তাঁদের এরকম অভিমতও প্রকাশ পেয়েছেযে। তাঁরা ছেলেবেলায় বেত ও ঝনমলা খেয়ে বাংলা বানান শিখেছেন, এ যুগের শিশুরাই বা তা শিখতেপারবে না কেন ঞ্জ

বিজ্ঞান তো সহজ সরল সুন্দর এবং উন্নত ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। বাংলা ভাষার বিজ্ঞান - ভিত্তিক আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার দ্বারা বাংলাভাষাকে উন্নত করা যাবে না কেন ঞ্জ আমরা ছেলেবেলায় বেত ও ঝনমলা খেয়েছিএই জন্য যে পূর্ববতীরা বাংলা ভাষা ও বানানকে সহজ সরল সুন্দর এবং উন্নত করতে পারেননি। আজ যদি অকারণ- সংস্কার ত্যাগ করে বাংলাভাষাকে বর্তমান মহাকাশ যুগের উপযোগী সাবলীল ও উন্নত করা যায়, তবে তা থেকে বিরত থাকা অর্থহীন। কম্পিউটারে কাজ করার ব্যাপারটা একক্কালে খুবই জটিল ছিল, পরে তা ত্র(মে সহজ হয়ে এমন সূচিভিত্তিকপরিচালন(ম (মেনু অপারেটেড) হয়েছে। কম্পিউটারের মূষিক (মাউস) ক্লিক করলেই নির্দেশ মেনেকম্পিউটার কাজ করে। কম্পিউটারের মতো জটিল যন্ত্রচালনা এত সহজ হয়ে গেছে বলে কি প্রাচীন দিনের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরা হতাশ হয়ে মুষড়েপড়বেনঞ্জ না কি তাঁরা খুশি হবেন সহজে সবাই কম্পিউটার ব্যবহার করতেপারছে দেখে। যন্ত্রটি কেবল কম্পিউটার শি(িত লোকের এক্তি(য়ারভুক্ত(থাকা তাঁরা বাঞ্ছনীয় মনে করেননি, তাই গবেষণা ও পরিশ্রম করে তাঁরা ব্যাপারটা সহজ করে দিয়েছেন। বাংলা ভাষা ও বানানে ব্যাপারটাকে পণ্ডিতেরা কেন কেবলমাত্র উচ্চ শি(িতদের আওতাভুক্ত(রাখতে চাইবেন ঞ্জ গভীর গবেষণা ও পরিশ্রম করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা শি(কদের কাছে তাঁরা তা সহজ করে দিন। তবেই তো তাঁদের পাণ্ডিত্য সার্থক হবে। তাঁরা জ্ঞানী বলেই তো মানুষকে অকারণ সংস্কার ও প্রথাবদ্ধতার বাইরে এনে মুক্ত(পথ দেখাবেন।

যদিও প্রথাবদ্ধতার ব্যাপারটা অনেকের মনে এমন বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, সংস্কৃত ভাষায় যেহেতু ..চীন.. লেখা হত তাই শব্দটির বানান বাংলায়ও .. চীন.. হবে। অরা জানি যে সংস্কৃত খুবই উন্নত ভাষা, তা থেকে শত শত শব্দ আমরা গ্রহণ করেছি, কিন্তু গ্রহণ করার পরেতো তা বাংলা শব্দ হয়ে গেছে। সুতরাং তা বাংলা উচ্চারণরীতি মেনে বাংলা বানানে লিখতে হবে। ইংরেজি, ফরাসি বা জার্মান রাশিয়ান চিনা পর্তুগিজ তামিল তেলুগু অহমিয়া ওড়িয়াশব্দ গ্রহণ করার বেলায় তার বঙ্গীকরণ হয়, এবং শব্দটি বাংলা উচ্চারণ অনুসরণ করে বাংলা বানানে লেখা হয়। কিন্তু সংস্কৃতের বেলায় কেন তা হবে না ঞ্জ

সংস্কৃতের বেলায় তা না হবার অবশ্য একটি গু(ত্বপূর্ণ কারণ আছে। কারণটি হল, বাংলায় সংস্কৃতের বর্ণমালা গ্রহণ করা হয়েছে, এবং বাংলা হরফে সংস্কৃত লেখাও হয়। তাই একটি শব্দ যখন সংস্কৃতে লেখা হচ্ছে তখন তার যে-বানান, সেটি বাংলায় লেখার কালে ঠিক তেমনি করে না লিখলে বিভ্রাট হবে। এজন্যই সংস্কৃত শব্দটি বাংলায় গ্রহণ করার পরে তার উচ্চারণে যতই পরিবর্তন হোক তার বানান আর পালটানো হয় না। আত্মীয় আর আত্তিয়হয় না। বিশেষ করে অতীতে যখন বাংলার উপরে সংস্কৃতের প্রভাব অনেক বেশি ছিল তখন এটা ছিল আরও অসম্ভব। ইংরেজ আমলে যখন ইংরেজরা বাংলা শেখার জন্য সংস্কৃত-পণ্ডিতদের কাছে পাঠ নিতে শু(করেন, তখন সংস্কৃতপণ্ডিতেরা বাংলাভাষার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে শু(করেন, এবং বাংলা বানানকে সংস্কৃতের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। যদিও এর আগে সংস্কৃতপণ্ডিতদরা বাংলা ভাষাকে ব্রাত্য, পতিত ভাষা মনে করতেন, এবং বাংলা ভাষার কোনও গু(ত্বই প্রায় তাঁদের কাছে ছিল না। কিন্তু ইংরেজদের পাকেপড়ে সেই পতিত ব্রাত্য বাংলাই হয়ে দাঁড়াল তাঁদের জীবিকার সূত্র। বাধ্য হয়ে তখন বাংলা চর্চা করতে গিয়ে বাংলা ভাষার বানানকে তাঁরা সংস্কৃতমুখী করে তোলেন। তার আগে যে সকল বাংলা পুথি পাওয়া গেছে তার বানান দেখলে একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এবিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব্যঙ্গ করে লিখেছেন যে, ইংরেজরা বাঙালিকে বাংলাভাষা শেখাতে আরম্ভ করে। আমাদিগের দুর্ভাগ্যত্র(মে যে সময়ে ইংরেজ মহাপু(ষেরা বাঙালিদিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, সেই সময়ে যে - সকল পণ্ডিতের সহিত তাঁহাদের আলাপ ছিল তাঁহারা সংস্কৃত কালেজের ছাত্র। তখন সংস্কৃত কালেজ বাংলায় এক ঘরে। ... সুতরাং তাঁহারা দেশে কোন্ ভাষা চলিত কোন্ ভাষা অচলিত, তাহার কিছুই বুঝিতেন না। হঠাৎ তাঁহাদিগের উপর বাংলা পুস্তক প্রণয়নের ভার হইল। তাঁহারাও পণ্ডিত স্বভাব সুলভ দাম্ভিকতা সহকারে বিষয়ের গু(ত্ব কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন। পণ্ডিতদিগের উপর পুস্তক লিখিবার ভার হইলে তাঁহারা প্রায় অনুবাদ করেন। সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতেরাও তাহাই করিবেন। ...রাশি রাশি শব্দ বিভক্তি(পরিবর্জিত হইয়া বাংলা অ(রে উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়া পুস্তকমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। ... এই শ্রেণীর লেখকের হস্তে বাংলাভাষার উন্নতির ভার অর্পিত হইল। লিখিত ভাষা ত্র(মেই সাধারণের দুর্বোধ ও দুষ্পাঠ্য হইয়া উঠিল। ... অনেক সময়ে তাঁহাদের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতেও তত চলিত নহে, কেবল সংস্কৃত অভিধানে দেখিতেপাওয়া যায় মাত্র। শুনিয়াছি গ্রন্থকারদিগের মধ্যে দুই - পাঁচ জন হয়

একখানি অভিধান, না - হয় একজন পণ্ডিত সঙ্গে লইয়া লিখিত বসিতেন। এই সকল কারণবশত, বলিয়াছিলাম যে, যাঁহারা বাংলা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভালো বাংলা শিখেন নাই। লিখিত বাংলা ও কথিত বাংলা এত তফাত হইয়া পড়িয়াছে যে, দুইটিকে এক ভাষা বলিয়াই বোধ হয় না। দেশের অধিকাংশ লোকেই লিখিত ভাষা বুঝিতেপারে না। ...গ্রন্থকারেরা বাংলাভাষা না শিখিয়া বাংলা লিখিতে বসিয়া এবং চলিত শব্দ সকল পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত শব্দের আশ্রয় লইয়া ভাষার যে অপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিকার করা শক্ত(। এ বিষয়ে সুকুমার সেন মহাশয়ও অকপটে স্বীকার করেছেন যে, বাংলা ভাষা প্রবন্ধটিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের যে অর্ন্তদৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে তা আর কোনো বাংলাভাষার আলোচনাকারীদের মধ্যে দেখিনি। এমন কি রবীন্দ্রনাথও এমন কথা বলেননি।

বাংলা ভাষা ও বানান আপন স্বাভাবিক গতিপথ বেয়ে যেভাবে বয়ে চলছিল, গড়ে উঠেছিল, তা ইংরেজ আমলের এই সময়ে এসে প্রধানভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। অবশ্য মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (বাংলাদেশ) তাঁর বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমী(া গ্রন্থে বলেছেন, চৈতন্যসাহিত্য বাংলাভাষায় যে কেবল জীবন চরিত লেখার প্রবর্তন করল, তা-ই নয়, ভাষার ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলা বানানেও সর্বপ্রথম বিশুদ্ধতা র(ার চেষ্টা করতে লাগল। এরপ্রধান কারণ এই যে, চৈতন্য চরিতকারেরা সকলেই সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। সেজন্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ব্যাপক ব্যবহার ও সেগুলির বানানের বিশুদ্ধতা র(ায় তাদের যত্ন ও চেষ্টা স্বাভাবিক। এভাবে ভারতচন্দ্র রায়ের আবির্ভাবের পূর্বেই সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ ও সেগুলির বানানের বিশুদ্ধতা র(ার চেষ্টা বাংলাভাষায় বিশেষভাবেই বিস্তৃতিলাভ করেছিল।

বিভিন্ন মান্য প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে বাংলা বানান সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে আছে --- বি(্বভারতীয় বি(্ববিদ্যালয় (১৯২৫), কলকাতা বি(্ববিদ্যালয় (১৯৩৬/৭), আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯৮৯), বাংলা একাডেমী -- ঢাকা (১৯৯২), এবং সম্প্রতি পঃ বঙ্গ বাংলা আকাদেমি (১৯৯৭)। এঁরা বানানে বিশুদ্ধতা, বানানের নিয়ম, বানানে সমতা, নিজস্ব ব্যবহার -বিধি ইত্যাদির উপর গু(ত্ব দেন। এঁরা আসলে কেউই প্রকৃত বানান সংস্কার করেননি, বরং বানান - বিধান দিয়েছেন। এই উদ্যোগগুলিকে আমরা বাংলা বানান- সং স্কারের উদ্যোগ বলে জানি। এতাবৎ বানান - সংস্কারের তিনটি প্রকৃত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম সংস্কারটি করেন ঈ(্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় (১৮৫৫), দ্বিতীয়টির উদ্যোক্ত(া পূর্ববঙ্গ সরকারি ভাষা কমিটি (১৮৪৯) এবং তৃতীয় সংস্কারটি করেন পঃ বঙ্গ সরকার (১৯৮১)। প্রথম ও শেষ --- এই উদ্যোগ দুটি কার্যকর হয়েছে। পূর্ববঙ্গ সরকারি ভাষা কমিটির উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হয়নি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা বর্ণমালার বিন্যাস নতুনভাবে করেন। বাংলা বর্ণমালা থেকে তিনি দীর্ঘ -ঋ এবংদীর্ঘ ৯ বাদ দেন। অনুস্বর এবং বিসর্গকে স্বরবর্ণের মধ্যে না রেখে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্থান দেন। চন্দ্রবিন্দুকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলে গণ্য করেন। যেহেতু ক এবং ষ যোগ করে (হয় -- এটি যুক্ত(বর্ণ, তাই বর্ণমালা থেকে এটি বাদ দেন। এছাড়া, ড় ঢ় য় তিনটিকে ড ঢ য় থেকেপৃথক করে বর্ণমালায় গ্রহণ করেন (১৮৫৫)। এর ১২৬ বছর পরে বর্তমান পঃ বঙ্গসরকার (১৯৮১ - তে) বাংলা বর্ণমালা থেকে অন্তঃস্থ - ব বাতিল করেন। অবশ্য এটির কোনও বাস্তব প্রতিক্রি(য়া নেই, এমন কি এটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণও করেনি।

বিদ্যাসাগরের আগে বাংলায় স্বরবর্ণ ছিল ১৬, এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৪, এই মোট ৫০ বর্ণ। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত এ গ্রামার অব দি বেংগল ল্যাংগোয়েজ (১৭৭৮) বইখানিতে এর নিদর্শন পাওয়া যাবে (পৃঃ ৪)। বিদ্যাসাগরের হাতে নতুন বিন্যাস ও সংস্কার হবার পরে (১৮৫৫) বাংলা বর্ণমালা হয়, স্বরবর্ণ ১২, এবং, ব্যঞ্জনবর্ণ ৪০, এই মোট ৫২ বর্ণ নিয়ে গঠিত।
সাম্প্রতিক সংস্কারের পরে বর্তমানে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে আছে ৩৯ বর্ণ, স্বরবর্ণ থেকে আগেই ৯ (লি) বাতিলল হয়ে গেছে বলা যায়, নতুন বইয়ে তা নেইও, তাই স্বরবর্ণ ১১ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯, এই মোট ৫০ বর্ণ নিয়ে বর্তমান বাংলা বর্ণমালা গঠিত।
ইংরেজিতে একটি বাক্য আছে যে বাক্যটি ইংরেজি সকল বর্ণ নিয়ে গঠিত। ট্ট ত্বহ্চট্রন চত্মথ্থ্ত্ত্ব ঠ্থদ্ধ গ্লহুত্তত্নত্র থদ্দড্রত্ম বণ্ড্র্ড্র স্ট্রদ্বদ্ধড্ড্খণ্ড. বাংলা বর্ণমালার প্রচলিত সকল বর্ণ অথাৎ ১১ টি স্বরবর্ণ, ৪০ টি ব্যঞ্জনবর্ণ এই মোট ৫১ টি বর্ণ, দশটি স্বরচি‎হ্(, আটটি ফলা চি‎হ্(নিয়ে এমনি একটা বাক্য হল ঃ---
বিষণ্ণ ঔদাসীন্যে ঊষাবৌদি বাংলাভাষায় প্রচলিত ঈশবের নিখুঁত গল্পটির অর্ধেক বলতেই ঋতু ভুঁইএ(া আর ঐন্দ্রিলা দা(ণ হৈ হৈ করে উঠল --- ওঃ, ব্যাস, এবার থামো বুঝেছি বড্ডো পুরানো ঢঙের ক্যামন এক গল্প, যার নীতি বাক্য হল --- মূঢ় আড়ম্বর ও আত্মশ্লাঘার ফল জীবনে বিঘ্ন ও বৃহৎ (তি---তাই না ঞ্জ

বাংলা বানান সংস্কার করা কেন দরকার তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ হল যে বাংলা বর্ণমালায় কটি বর্ণ আছে তা নিশ্চিতভাবে চট করে শি(িত লোকেরাও প্রায় কেউই বলতেপারবেন না। বাংলা বর্ণমালাই এতটা অনিশ্চিত, সুতরাং বাংলা বানান যে কী পরিমাণ অনিশ্চিত অনিয়ন্ত্রিত এবং বিশৃংখল, তা এ থেকে সহজেই বোঝা যাবে। অথচইংরেজি বর্ণমালায় যে ২৬ টি বর্ণ আছে তা সাধারণ শি(িতরাও সবাই এক বাক্যে বলে দিতেপারবেন। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, কিন্তু তা কতটা অনাদৃত অবহেলিত জীর্ণবাস পরা তা কি এ থেকে বোঝা যাচ্ছে না ঞ্জ তাকে একটুযত্নে কি আমরা পরিচর্যা করতেপারব না ঞ্জ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বলে অনেক আবেগ দেখানোর চেয়ে কঠোর নির্বিকার হাতে কর্তব্য সাধনের জন্য বাংলাভাষা এবং বানান সংস্কার অনেক জ(রি।

অবঙ্গীয় নাম, এবং স্থানের বানান নিখুঁত উচ্চারণমূলক করে লেখার চেষ্টায় গাভাস্কর লেখা হয় গাওস্কর, সোনিয়া লেখা হয় সনিয়া, পুনা হয় পুণে, এমনি মেরঠ, আডবাণী, অম্বেডকার, পাটিল, পটৌডী, ইলাহাবাদ ইত্যাদি। অন্যভাষার নাম, স্থাননাম ইত্যাদির ব্যাপারে আমাদের এত সতর্কতা, কিন্তু নিজের ভাষার ব্যাপারে আমরা কী করছি ঞ্জ নিজের ভাষায় সর্বত্র শব্দের উচ্চারণ - অনুযায়ী বানান লেখা যাবে না কেন ঞ্জ সেখানে আমাদের দ্বিধা অনীহা কেন ঞ্জ কেন জলের তলায় মাথা ডুবিয়ে সমস্যা এড়াবার, সকল দায় এড়াবার চেষ্টা ঞ্জ

বাংলা বানান সংস্কার মূলত বাংলা বর্ণমালা সংস্কার। বর্ণমালা সংস্কার না-করে নেওয়া হবে তা বানানে সমতা বিধান, বিশুদ্ধতা র(া ইত্যাদি কার্যক্র(মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তা প্রকৃত বানান - সংস্কার আর হবে না। খোলসা করে বললে বলতে হয়--- এসকল বানান - সংস্কার হল হাতুড়ে সংস্কার। কোনও সু-নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিকপথ ওপদ্ধতি মেনে তা হয়নি বলে, যে সকল (েত্রে বানান সংস্কার করা হয়েছে, এমন কি সে সকল (েত্রেও প্রায় হাতড়েবা টস্ করে বানান ঠিক করতে এবং লিখতে হয়। অর্থাৎ বানান নিশ্চিত হয়নি বলে ভুলের সম্ভাবনাও কমেনি। কিন্তু বাস্তবে কি বানান ভুল কমেনি ঞ্জ হ্যাঁ কমেছে, কেবলমাত্র যাঁরা সতর্ক সাবধান এবং নিয়মিত চর্চাকারী তাঁদের (েত্রেই তা কমেছে। বানানটা এঁদের খুব কঠিন সমস্যা নয়। যে রীতিপদ্ধতিই বলা হবে এঁরা তা যতটা সম্ভব সফলভাবে প্রয়োগ করবেন। কিন্তু নানা দরজা খুলে রেখে কোন্টা দিয়ে ঢুকতে হবে, কোন্টা দিয়ে ঢোকা যাবে না, কখন তিন পা পিছিয়ে এসে, চার পা বাঁদিকে যেতে হবে এবং তারপরে লাফ দিতে হবে তা ব্যস্ত গৃহী মানুষের প(ে মেনে চলা কঠিন। বানান - ঈ(্বর তাঁদের কাছে তাই অধরাই থেকে যায়। কিন্তু পথ এবং দরজা যদি কেবলমাত্র একটাই খোলা থাকে এবং তা যদি একমুখী হয়, তবে বানান ভুল হবে না, বানান ভুল করাই যাবে না। একমুখী শৃংখলিতপথেচলতে অবশ্য কবিদের মনে হয় বড়ই মানসিক বিতৃষ(া এসে যাবে, এবং তাঁরা (ুব্ধও হবেন। এযুগের কবিদের পয়ার ইত্যাদি কবিতার ছন্দের বাঁধনই মানেন না, মুক্ত(ছন্দে তাঁরা পরিচরণ করেন। তাই এবার এই ভাষায় বাঁধনে পড়েতাঁদের কবিত্ব কেমন প্রকাশ পায় তা-ই দেখার। কবিদের উল্লেখ করার কারণ---একজন খ্যাত কবি কিছুকাল আগে বাংলা বানান আমূল সংস্কারের এক গু(ত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন দেশ সাহিত্য পত্রে (১৯৭৮)। সেই কবিকে অন্য এক খ্যাত কবি অনুরোধ জানালেন যে এতে উচ্চারণের অতি সূক্ষ্ম ব্যত্যয় হবে।

(যদি হয়) কবিদের অনুভূতিতে হয়তো সেই অতি সূক্ষ্মতা ধরা পড়ে। তাহলে যেখানে সত্যি সত্যি অতি স্পষ্ট পৃথক উচ্চারণ সেখানে কেন উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখার উদ্যোগ এবং অনুমোদন নেই ঞ্জ যা স্পষ্টই আছে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই, মাথাব্যথা

কেবল-- যা নেই তা নিয়ে। ঈ উচ্চারণ বাংলায় নেই, তবু তা আছে বলে ধরে নিয়ে সেই উচ্চারণ অনুয়ায়ী বানান লিখতে হবে বলে দাবি, কিন্তু যা আছে, অর্থাৎ --- আত্তিয় - কে আত্তিয় বলে লেখা যাবে না, লিখতে হবে আত্মীয়। ---১১১ -কেএকশ এগার লেখা হচ্ছে --- বলার বেলায় বলা হচ্ছে --- এ্যাকশ এ্যাগার। সাধারণ মানুষের বক্ত(ব্য অন্য রকম, যার খাবারই জোটে না তার শাড়ির ভাঁজ সাবুর মাড় দিয়ে করা হবে , না কি ভাতের মাড় দিয়ে করা হবে, এটা প্রধান বিবেচ্য হতে পারে না। তার শাড়িতে ভাঁজের দরকার নেই, শাড়ি পরিচ্ছন্ন থাকলেই হল, এবং তারও চেয়ে অনেক বেশি দরকার প্রয়োজনীয় খাবারের জোগান।

উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না হলে কেমন অসুবিধা হতে পারে তার দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরি, অ-এরস্বরচিহ্(, অর্থাৎ অ- ০ঙ্গ, যেমন আ - ভ্ত । যদি কোথাও লেখা হয়--- কমল কিনা জানি না। তবে এখানকার কমল

কথাটির কী অর্থ ঞ্জ এর দুটি অর্থ হতে পারে, এর দুটি ভিন্ন উচ্চারণ অনুসারে। উচ্চারণ আনুযায়ী সে বানান না লিখলে সহসা শব্দটির অর্থ উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিবেশ বা পরিপ্রে(িতে ন্তক্সন্দ্ধন্দপ্রব্ধ থেকে অর্থ উদ্ধার করার আগেই এটি পড়তে গিয়ে ভুল উচ্চারণে ভুল অর্থে পড়া হয়ে যাবে। এর উচ্চারণ অনুযায়ী বানান যদি হয় --- কম্‌লঙ্গ তবে অর্থ হবে কমিল, কমে গেল। আর যদি তা হয় কমঙ্গ ল্‌ তবে অর্থ হবে পদ্মফুল। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান না লেখায় এ(েত্রে বিপদ আছে। আবার---বাসক লিখলে তা হবে, বাসঙ্গ ক্‌ - গাছ বিশেষ এবং বাস্‌ কঙ্গ - পেটবা, চক্সপ্র, বার্সকো। এমনি আরও (েত্র আছে। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখলে সে সব (েত্রের ভুল এড়ানো যাবে। যেমন - কোন - কোনঙ্গ , কোনও, কোন্‌ মত- মৎ (অভিমত), মতো। প্রায় এমনি ধরনের আর একটি ব্যাপার হল - --১৬শ রজনী অতিত্র(ান্ত অভিনয়। এখানে ১৬শ লেখার অনভিজ্ঞরা ১৬শ বা ১৬শত রজনী ভাবতে পারেন। লেখটা দ্ব্যর্থবোধক হওয়া ঠিক নয়, এবং উচ্চারণ এড়িয়ে বানান লেখা তেমনি ঠিক নয়।

আরও এধরনের বিচিত্র ভুল আছে তবে তা প্রধানত ভাষাগত, বানানের ব্যাপারটা তেমন জড়িত নয়। যেমন--- মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক নির্বাচিত শিল্পীদের পুরস্কার প্রদান। এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে--- নির্বাচিত শিল্পীদের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কার প্রদান। তেমনি বইমেলাতে অবাধ শোনা যায়--- উপস্থিত সকল দর্শকদের..., কিংবা পাড়ার প্যান্ডেলে --- ভক্ত(বৃন্দদের সকলকে.. পরিশুদ্ধ ভাষায় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাবার উচ্চাকাঙ(ী অভিলাষ।

বাংলা বানানে আমূল সংস্কার দরকার --- কথাটির অর্থ হল বাংলা বর্ণমালার অ-প্রয়োজনীয় বর্ণগুলি বাতিল করতে হবে এবং যে মৌলিক স্বরধ্বনিটির বর্ণ বাংলায় নেই সেটি নির্মাণ করতে হবে। এসব কাজের জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা চাই। সেই পরিকল্পনা অনুসারে সুসংবদ্ধ উপায়ে ধাপে ধাপে এগোতে হবে। হঠাৎ করে সব পরিবর্তনটা একবারে করে ফেলতে চাইলে হবে না। তাতে অসুবিধা অনেক। বাড়ি সংস্কারের জন্য সব বাড়িটা একবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে আবার গেঁথে তোলার চেষ্টা করলে তার বাসিন্দারা কোথায় যাবেনঞ্জ তাই বাড়ির এক - একটি থাম, এক - একটি দেয়াল, এক-একটি জানালা বা তার পাল্লা, দরজার ছিটকিনি ইত্যাদি সারাই করতে হবে, বা পালটাতে হবে। এজন্য চাই একটি অতি সুষ্ঠু এবং সার্বিক পরিকল্পনা। নির্দিষ্ট সময় পর্ব ধরে একটু একটু করে অগ্রসর হলে কিছুদিন পরে দেখা যাবে বাড়িটি অনেক সুন্দর এবং সহজ - বাসযোগ্য হয়েছে, অথচ এজন্য জল কল আলোর অভাবে বা বালি সিমেন্ট চুন ইটের জঞ্জালে বেশি ভুগতে হয়নি, বরং তা ছিল সহ্যের সীমার মধ্যে। এটুকু অসুবিধা মানতেই হবে এবং মানা যাবে --- কারণ এর চেয়ে অনেক বেশি অসুবিধা এখন আমাদের রোজ সইতে হচ্ছে, এবং সব সময়ে সইতে হচ্ছে। বানান তথা ভাষা সংস্কার সম্পূর্ণ হলে এ সকল অসুবিধা প্রায় একশভাগ দূর হবে। সেই সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমাদের এগোতে হবে। সময়ের উপর, ভাগ্যের হাতে ব্যাপারটাকে ছেড়ে না দিয়ে পরিকল্পিত বানানপরিবার গড়ে তুলতে হবে, অর্থাৎ-- হরফে, বর্ণমালায়, বানানে, লেখায় এবং অন্যান্য পদ্ধতি প্রকরণে সাজিয়ে -- ভাষাকে ভূষিত করে পরিকল্পিত বানান - পরিবার গড়ে তুলতে হবে।

রূপগতভাবে ভাষাকে দুটি প্রধান ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি। একটি হল ভাষার আসল রূপ এবং অন্যটি তার কৃত্রিম রূপ। আসল রূপ-এ আছে উচ্চারণ এবং অর্থ। আর কৃত্রিম রূপ -এ আছে - বানান এবং রূপনির্মাণ। ভাষা তথা শব্দের প্রাণচিহ্(র এই চারটি অভিমুখ নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার।

আমরা মুখে যা উচ্চারণ করি বা বলি সেটাই আসল ভাষা। বানান হল ভাষার লিখিত রূপ। সেই লিখিত রূপ হল ভাষার হরফবদ্ধ কৃত্রিম রূপ এবং সেটা লেখা সম্পর্কীয় অভ্যাস সাপে(ব্যাপার। আবার ভাষাকে অন্যভাবে---উচ্চারিত এবং লিখিত---ভেবে দুটি ভাগেও ভাগ করা যায়। উচ্চারণ, তথা কথিত রূপ এবং বানানে যত মিল বা সাযুজ্য থাকবে লেখায় ভুল ততো কম হবে। উচ্চারণের সঙ্গে বানানের অভিমুখ যদি একই রেখায় না হয় বা জ্যামিতিকভাবে বললে, উভয়ের মধ্যে কৌণিক পরিমাণ যত বেশি হবে, বানানে ততো বেশি ভুল হবে, এবং তখন বানান মুখস্থ রাখতে হবে। যখনই বানান মুখস্থ করার প্রয়োজন দেখা যায় তখনই বুঝতে হবে যে উচ্চারণ এবং বানানে কৌণিক পরিমাণ বেড়ে গেছে, এজন্য মান্য প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে যাঁরা এই কৌণিক পরিমান কমিয়ে তা শূন্যের কাছাকাছি রাখবেন।

উচ্চারণ
ভাষা বানান - কোন
বানান

উচ্চারণ
আসল ভাষা
অর্থ
ভাষা
বানান
কৃত্রিম রূপ
রূপ নির্মাণ

ভাষার প্রাণচিহ্(র চিত্র হল এটি।
(বানান উচ্চারণমুখী হবে। বানান অনুসারে উচ্চারণ হবে না।)

উচ্চারণ এবং বানানে কোণের পরিমাণ যদি শূন্য হয় বা এই কোণকে যদি শমিত করা যায়, তবে বলার এবং লেখায় কোনও পার্থক্য থাকে না, যেমন--মা, দাদা,

বাবা, কাকা ইত্যাদি। যদি উচ্চারণ এবং বানানের মধ্যে কোণের পরিমাণ বাড়ে তবে বলায় এবং লেখায় পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন বলায় --- হাৎ, ভাৎ, রাৎ এগুলি লেখা হয়---হাত ভাত রাত। কোণের পরিমাণ যদি অনেক বেশি হয় তবে তা হয় -- আত্তিয় - আত্মীয়, গ্রিশ্‌শ - গ্রীষ্ম, সৃতি - স্মৃতি। এবং ম যুক্ত(হয়ে উচ্চারণ হবে স্ম। যেমন স্মর্তব্য, স্মার্ত। কিন্তু অনেক (্ত্রে তেমন উচ্চারণ হয় না, যেমন -- স্মরণ, স্মারক, বিস্মরণ, স্মৃতি ইত্যাদি।

অনেক শব্দ বাংলায় যা বলি সংস্কৃতে তা অনেকপৃথক। যেমন, সংস্কৃত অলাবু শব্দের অর্থ বাংলায় লাউ। সংস্কৃত দীপবৃ(বাংলায় দেরখো। আসলে সংস্কৃত শব্দ অলাবু যুগ যুগ ধরে একটু একটু করে উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত - অপভ্রংশ প্রাচীন বাংলা হয়ে আধুনিক বাংলায় অলাবু শব্দটিরই উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে লাউ। সেটাকেই আমরা শব্দটির অর্থ বা মানে বলে জানি, অর্থাৎ অলাবু মানে লাউ। এখানে অলাবুর ব হল বর্গীয় ব। অলাবু-র উচ্চারণেযুগ যুগ ধরে স্বরধ্বনি উ স্পষ্ট থেকে গিয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি ব ত্র(মে লুপ্ত হয়েছে, ফলে অলাবু থেকে শব্দটি নবীন উচ্চারণে হয়েছে লাউ। তেমনি, দীপবৃ(- দীব(ক্খ - দিঅ(ক্খ - দিঅরূখা- দেরখো। অস্মে - অম্‌হে - অম্‌হি --- আম্‌হি- আমি।

অলাবু মানে লাউ, দীপবৃ(মানে দেরখো, অস্মে মানে আমি। সংস্কৃত এ সকল শব্দের বাংলা মানেটা কোথা থেকে কী - ভাবে এলো তা এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অন্যান্য অনেক শব্দেও ঠিক একই ভাবে সরণ ঘটেছে। ইংরেজি শব্দ চস্লস্লস্ল বিদেশী শব্দ, এর মানে বই। এ(্ত্রে শব্দের অর্থটি কিন্তু একই পথে পাওয়া যায়নি। এ(্ত্রে ইংরেজি এবং বাংলা শব্দ দুটির বিষয় একই এবং সেখান থেকেই বুক চস্লস্লস্ল মানে বই পাওয়া গেছে।

শব্দের যে - বানান আমরা অনেকদিন থেকে দেখে আসছি, সেখানে পরিবর্তন হলে তা আমাদের চোখে লাগে, অর্থাৎ অভ্যাসে ব্যাঘাত ঘটে। ক+ ষ ঞ্চ(, জ+ এ(ঞ্চজ্ঞ, হ+ ম ঞ্চ(এগুলি হল যুক্ত(বর্ণ, এবং এদের প্রত্যেকের বিশেষ একটি করে গঠন আছে। তার ব্যত্যয় আমরা ঘটাতে চাই না। এগুলির এই বিশেষ বিশেষ রূপনির্মাণেইআমরা থিতু হয়ে আছি। যদিও পরী(া কখনও আমাদের কাছে পরীক্ষা নয়, তা বাংলা পরিখ্খা হয়েই (কিংবা পরিক্খা হয়েই) আছে। আমরা শব্দটিতে না সংস্কৃত উচ্চারণকে ধরে রেখেছি, না বাংলা বানানে শব্দটি লিখছি। এতোবড় রঙ্গ জাদু এতো বড় রঙ্গ।

একশভাগ উচ্চারণমূলক বানান সব(্ত্রে হয় না। সোনা একশভাগ বিশুদ্ধ হলে গহনায় ব্যবহার্য হয় না। অল্প পরিমাণ খাদ এমনভাবে মেশাতে হবে যাতে তা সহজ ব্যবহারযোগ্য হয় এবং সুন্দর ও উজ্জ্বলও হয়। যে পণ্ডিতেরা বানানের বিশুদ্ধতায় খুব বি(াসী, তাঁরা মনে করেন, যা চলছে মোটামুটি তেমনই চলুক, তা থেকে বেশি কিছু পরিবর্তন করা যাবে না, বা তা উচ্চারণমূলক বানানে লেখা যাবে না। তাঁরা বলেন---উচ্চারণমূলক বানান হল আকাশকুসুম। যদি তা-ই হয় তবে কেন উচ্চারণ - অভিধান তৈরি হল ঞ্জ কেবল কার্য(্ত্রে তেমন বানানে লেখা যাবে না

ঞ্জ লিখলে সেটা দোষের হবে ঞ্জ কেন যে লেখা যাবে না, সে ব্যাপারে তাঁরা খুব স্পষ্ট নন। বানান দেখতে বিদঘুটে হবে, এই ভয়ে কি ঞ্জ কিন্তু যখন রূগ্ন বানান (গ্ন লেখা হয় তখন বানানটি অনেকেরই জানা নেই বলে চোখ - সওয়া হয়ে আর কি তা বিদঘুটে থাকে না ঞ্জ কারণ ভগ্ন মগ্ন বানানে গ্ন আমাদের চোখ সওয়া আছে। মফস্বল এখন মফস্‌সল লিখলে দোষ হয় না, চিনি লিখলে আর মনে চিনচিনে ব্যথা জাগে না কিংবা ব্যাং, ট্যাংরা এখন বেঙ, টেঙরা লেখার দরকার নেই। বানান ব্যাপারটা তো এক অলিখিত সামাজিক চুক্তি((যদিও বানানগুলি লিখিত ব্যাপারই ক্ক তা শুধু শ্রাব্য নয়, দৃশ্যও বটে---ক্ক) বানান মুখস্থ রেখে লাল কালো সবুজ হলুদ নির্দেশ মেনে তা বিচিত্র করে

লিখতে হবে--- অর্থাৎ হাঁত - ঘোঁত সহ বানান মুখস্থ রাখতে হবে। বানানের সকল দুর্বলতা এখানেই। যদি তা সহজ সরল করে এমন করা যায় যে, লিখতেপারে বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই, এবং বানানেও ভুল হবে না, তবে তা করতেপণ্ডিতেরা কি বাধা দেবেন ঞ্জ জলের মতো সোজা ব্যাপারটা কি তাঁদের ঠিক তেমন পছন্দ নয় ক্ক সকল লোককে যদি তাঁরা সহজ বানানের মাধ্যমে সঙ্গে পান তাহলে প্রায় ১৯ কোটি মানুষের দিকে তাঁদের তাকিয়ে এ ব্যাপারে বাধা দেওয়া উচিত হবে না। পণ্ডিতেরা মানুষকে সুপথে পরিচালিত করবেন, তা না করে কেন তাঁরা অকারণ এবং দুর্বোধ্য নিয়মের মধ্যে আটকে রাখছেন ঞ্জ

আফ্রিকায় একটি উপজাতি আছে যাঁরা ঠোঁট ফুটো করে কাঠের মোটা গহনা পরেন। ব্যাপারটি খুবই কষ্টকর কিন্তু নারীপু(ষ নির্বিশেষে এটা তাঁদের অবশ্য পালনীয়। আমাদের প্র(ে অকারণে এত দুঃখ বহন কেন ঞ্জ সেটা কি তাঁরা সুসভ্য হয়ে ওঠেনি বলে ঞ্জ পণ্ডিতদের কাছে সাধারণ বাংলাভাষীর প্র(ে--- অকারণে এত বানান - দুঃখ বহন কেন ঞ্জ সেটা কি আমরা বানান - প্রশাসনে সুসভ্য হয়ে উঠিনি বলে ঞ্জ

পৃথিবীর সব ভাষাতেই উচ্চারণ এবং বানানের মধ্যে কমবেশি এই বিরোধ আছে. সংস্কার - বিরোধীরা একথা শুনে অবশ্যই খুশি হবেন। তাহলে আর বাংলা ভাষা ব্যতিত্র(ম হল কোথায় ঞ্জ দোষটা বাংলাভাষার একার নয়---পৃথিবীর সব দেশের সব ভাষারই ক্কপৃথিবীর সব দেশের সব লিখিত ভাষায় এই ত্রুটি আছে মানলাম, যে, দোষ এড়ানো যায় না। ঠোঁটে কাঠের গহনা পরার জন্য একদল মানুষ দোষী , কারণ তারা অঙ্গচ্ছেদ করে গহনা পরছেন। একবাক্যে তাঁরা অসভ্য বলে চিহ্নি(ত, কিন্তু ঠোঁটের বদলে যদি কর্ণ ভেদ করে, এবং কাঠের বদলে মূল্যবান সোনা এবং হিরের গহনা পরা হয়, তবে তাও একই রকমভাবে অসভ্যতার চিহ্ন(। পৃথিবীর সব জাতি এটা করে থাকেবলে তা দোষ - মুক্ত(ব্যাপার নয়। সোজা করে বললে বলতে হয় --- মানুষ সভ্যতার যে - সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে, সেই সংজ্ঞা অনুসারেই মানুষ নিজেই এখনও সভ্য হয়ে ওঠেনি। পৃথিবীর কোনও জাতিই এই কর্ণ - রোগ মুক্ত(নয় বটেকিন্তু পৃথিবীর একটি জাতি অন্তত বানান - রোগ মুক্ত(। তাঁরা হলেন কোরিয়াবাসী। তাঁরা আপন চেষ্টায় এই অসাধ্য সাধন করেছেন। আমরা তাঁদের সৃষ্ট উদাহরণ থেকে হয়তো কিছু বল ভরসা পেতেপারি। অন্তত একটু সংস্কারমুক্ত(হতে তো পারি যে বানানকে সম্পূর্ণ উচ্চারণমুখী করায় দোষ নেই। (বলা ভালো যে - দোষ তো নেই-ই বরং সেটাই খুব স্বাভাবিক। আমরা কখনও করিনি বা করি না বলেই স্বাভাবিক ব্যাপারটাকেই বরং আশ্চর্য এবং অস্বাভাবিকমনে হয়। ধূমপান করা, চা হাওয়া প্রায় সকলেলরই অভ্যাস, কেউ তার ব্যতিত্র(ম হলেই অস্বাভাবিক লাগে ক্ক।

ভাষা বিজ্ঞানী পবিত্র সরকার তাঁর বাংলা বানান সংস্কার সমস্যা ও সম্ভাবনা গ্রন্থে লিখেছেন --- মনে রাখতে হবে, ইতালীয় চেক কিয়ৎপরিমাণে স্প্যানিশ ও জর্মন ইত্যাদি ভাষায় উচ্চারণ - অনুগ বানানের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তাতে সজ্ঞান ও সচেতন পরিকল্পনার চেয়ে ঐতিহাসিক বিবর্তনের দান অনেক বেশি। এদের লিপি রোমক হওয়ায় তাতে আরও সুবিধা হয়েছে। লিপিকররা লেখায় উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখেছেন, পারে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনে সেই বানানই মান্য বা স্ট্যান্ডার্ডাইজ্‌ড রূপ পেয়েছে. এও মনে রাখতে হবে যে, মুদ্রাযন্ত্র না হলে বানান স্ট্যান্ডার্ডাইজ্‌ড করা সহজ হত না। (পৃঃ ৩৩)। মুদ্রাযন্ত্রের কারণে বানান প্রচল যেমন সহজ তেমনি সে বানানের সামান্যপরিবর্তন করাও খুব দুরূহ ব্যাপার। পবিত্রবাবু এরপরেই লিখেছেন--- তা সত্ত্বেও ইংরেজি, ফরাসি ইত্যাদি অনেক বাষারই বানান ও উচ্চারণে বহুবিধ অসংগতি থেকে গেছে। ওয়েবস্টার সাহেব মাথার ইংরেজি প্রতিশব্দ ড়্দ্ধস্ত্ত -এর বানান ড়্দ্ধস্ত্ত ছাপিয়ে দিয়েও কীভাবে তাঁর অভিধানের পরের সংস্করণে মানুষের প্রতিবাদে আবার সেই প্রাচীন ড়্দ্ধস্ত্ত -এ ফিরে গিয়েছিলেন, সে খবরও অনেকে রাখেন। ফলে বানান সংস্কারের, এবং বানানকে ধ্বনি-সংগত করার পদ্ধতিগত ও সামাজিক দুরকম সমস্যাই বেশ আছে। বিমিশ্র শব্দভাণ্ডার যে - ভাষায় লিখিত রূপে বেশি প্রকট, তার সমস্যাই বেশি।

১৯৩৬ -এ কলকাতা বি(্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন--- কলিকাতা বি(্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত নূতন বানানপদ্ধতি সম্বলিত একটি পুস্তিকা বাহির হয় এই পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিতর্কের প্রবলঝড় ওঠে। বাংলাদেশের বিদগ্ধ সমাজ দুটি দলের বিভক্ত(হয়ে পড়েন(বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি -- বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, পঃ ২২)। কিন্তু এর ৫৫ বছর পরে ১৯৯১ - তে আনন্দবাজার পত্রিকা যে বানান সংস্কার সম্বলিতপুস্তিকা প্রকাশ করেন তার বি(দ্ধে কোনও (োভ ল(্য করা যায়নি। তার কারণ সম্ভবত তিনটি---(১) মানুষ অনেক বেশি পুরানো- সংস্কার মুক্ত(এবং উদার হয়েছেন। (২) এখানে বানানের সংস্কার অতি সামান্যই করা হয়েছে, (৩) এটা একান্তভাবে আনন্দবাজারের নিজস্ব ব্যবহার বিধি, এ বানান মানতে অন্য কারও দায় নেই। তা না থাকলেও এই বানানরীতিএখন ব্যাপকভাবে চলেছে । চিনি, হিরে, সুতো, ধুলো লেখায় প্রবল বাধা আসছে না। তবে মাত্র কিছু কিছু শব্দে এসব সংস্কার হয়েছে, আর তা তো সমস্যার তুলনায় সমুদ্রে শিশির- ফোঁটার মতো ব্যাপার, আর এসব মৌলিক কোনও সংস্কারও নয়--- হাতুড়ে সংস্কার না হলেও. তা হাতড়ে হাতড়ে সংস্কার তো বটেই ক্কনইলে বানান

নিয়ে গড়াগড়ি এখানেও কম নেই। বলা ভাল, তথাকথিত বানান সংস্কারের পুস্তকেরও প্রত্যেকটিতে বানান নিয়ে হরেক গড়াগড়ি লেগেই আছে। একটু গভীরে ঢুকলেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

কোরিয়ার ভাষার যে কথা বলছিলাম এবার সে প্রসঙ্গে আসি। কোরিয়ার লোকেরা উচ্চারণ এবং বানান সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছেন। এজন্য তাঁদের সজ্ঞান এবং সচেতন উদ্যোগ নিতে হয়েছে। উদ্যোগ নিলে যে এমন একটা অসম্ভব কাণ্ড (অন্য সবার ধারণায়ক্ক) ঘটানো যায়, তা তাঁরা হাতেকলমে প্রমাণ করেছেন আসলে উচ্চারণ এবং বানানের মধ্যে এই যে কৌণিক বিচ্যুতি, তা আমাদের নিরঙ্কুশ অনুদ্যোগকেই তুলে ধরে।

..বড়ন্দ্ব ভ্রজনৰ্দ্ধন্তন্ধ ন্মাজপ্সস্তুন্দপ্প ন্ত ৰ্দ্ধড়ন্দ্ব ত্মন্দ্বন্মাত্তস্তুনন্তু প্সন্দ্র ন্স্পজন্দ্র ড্রব্দ ন্তৃন্দ্ধ ব্দপ্সপুন্দ্বস্তুক্রস্তু ৰ্দ্ধভন্মান্দ্বভ্রজনৰ্দ্ধন্দ্বজব্দ ড্রন্দ্ব ন্তৃন্দ্ধ স্তুন্দ্বনব্দন্দ্বস্তু ন্দ্রপ্সজ ভ্রজনৰ্দ্ধ-ন্তন্ধ ন্স্পজন্ধ ভ্রনৰ্দ্ধড়ত্র ড়প্সজনত্রপ্সন্ধপ্ত পুন্দ্বন্দ্রৰ্দ্ধ-ৰ্দ্ধপ্স-জনৰ্দ্ধড়ৰ্দ্ধত্রস্তন্মান্ধৰ্দ্ধনপ্সন্ত প্সন্দ্র ৰ্দ্ধড়ন্দ্ব ৰ্দ্ধজ্ঞস্তুনৰ্দ্ধনপ্সত্রপুত্রপুন্মাড্রন্দ্বৰ্দ্ধ. ঢৰ্দ্ধ নব্দ ব্দত্তন্মান্মাপ্সব্দন্দ্বস্তু ৰ্দ্ধপ্স ন্তৃ ব্দপ্স ড়নৰ্দ্ধড়পুন্ত ব্দন্তুনন্দ্ধৰ্দ্ধনন্দ্রনন্তু ন্ত ন্মাজনন্তুনন্মাপুন্দ্ব ৰ্দ্ধড্রৰ্দ্ধ ন্দ্বন্ধ ৰ্দ্ধড়ন্দ্ব ঢন্ধৰ্দ্ধন্দ্বজ্জ্রৰ্দ্ধনপ্সত্রপ্ত তুড়প্সন্দ্বৰ্দ্ধনন্তু. ত্রস্তুপ্সস্তুপুব্দ ড্রন্দ্ব ৰ্দ্ধপ্স স্তুভ্র ন্তৃন্দ্রপ্সজন্দ্ব ৰ্দ্ধড়ন্দ্ব ন্স্পজন্দ্ধ ত্রপুন্মাড্রন্দ্বৰ্দ্ধ ছণ্ণপ্সড় ত্রৰ্দ্ধজজ ন্পপ্প, ‘ঢন্স-ত্মন্দ্বপ্পন্তৰ্দ্ধৰ্দ্ধপ্স ন্তুস্তু্প্সপ্ত. ঢঢঢ ন্স. ৪ ত্রন্দ্বন্মাৰ্দ্ধন্দ্বপ্পন্দ্বজ ১৯৪৭. ত্তজ. ন্পপ্প ভ্রব্দ প্সন্দ্ব প্সন্দ্র ৰ্দ্ধড়ন্দ্ব ৰ্দ্ধন্দ্বস্তুড়নন্তুন্দ্রন্দ্ব ভ্রড়প্স স্তুন্দ্বন্দ্বপুপ্সন্মান্দ্বস্তু ৰ্দ্ধড়ন্দ্ব ন্স্পজন্দ্ধ ৰ্দ্ধভন্মান্দ্বভ্রজনৰ্দ্ধন্দ্বজ প্সন্দ্বভস্তুজস্তু.গ্ন ঔপ্সজপ্পন্দ্বজপুন্ত. বড়ন্দ্বত্রপুন্মাড্রন্দ্বৰ্দ্ধ —্ড়নন্তুড় ভ্রব্দ ন্ননন্দ্ধৰ্দ্ধন্দ্বস্তু ন্ত ট্র. ডড. ১৪৪৬ ন্তু প্সন্তুন্ধ ত্রন্তুড় —ণ্ণপ্সন্দ্বত্রব্দ ত্তব্দন্দ্বস্তু্ন্দ্বজৰ্দ্ধনন্তুপুপুন্ত ন্ত ন্তুপ্সপুত্তপ্পন্দ্ব ন্দ্রজপ্সপ্প জনৰ্দ্ধড়ৰ্দ্ধ ৰ্দ্ধপ্স পুন্দ্বন্দ্রৰ্দ্ধ ন্ত ন্তুপ্সন্দ্ধপুপ্সপ্পন্দ্বজ্জ্রৰ্দ্ধন্দ্বস্তু ব্দভপুপ্তন্তু ত্তনৰ্দ্ধব্দ নপ্পনৰ্দ্ধৰ্দ্ধনন্তন্ধ ট্রড়নন্দ্বব্দন্দ্ব স্তুড্রজ্ঞন্তুৰ্দ্ধন্দ্বজব্দ. /বড়ন্দ্ব ত্তব্দন্দ্ব প্সন্দ্র্ন্দ্বজ্জ্রন্তুত্তপ্তজ প্সন্ধৰ্দ্ধন্দ্ব ন্ত ন্দ্বস্তুত্তন্তৰ্দ্ধনপ্সন্ত --- হুত্ত্রত্রট্রথ, ত্তুজনব্দ — ১৯৫৩ ছন্মা-৩৪গ্ন

সুতরাং উচ্চারণ এবং বানানে সম্মিলন ঘটানো কোনও অসম্ভব ব্যাপার নয়, অবাস্তব বা আশ্চর্য ব্যাপারও নয়। সঠিকপথ এবং পদ্ধতিতে এগোলে তা করা সম্ভব, এবং করা উচিত।

গানে মীড় থাকে, অর্থাৎ সুরে ঢেউ খেলে যায়। গানের কথা বা বাণীর মধ্যে সেই ঢেউ দেখাবার দরকার নেই বা দেখানো হয় না, স্বরলিপির মধ্যে সেটা থাকে। মায়াবন - বিহারিণী হরিণী... গাইবার সময়ে তার সুরলিপি (স্বরলিপি) ধরে ধরে বিশেষ প্রত্রি(য়ায় গাইতে হয়। এটা সাধারণ লেখার মধ্যে দেখানো হয় না বা দেখাবার দরকার নেই। কবিতা আবৃত্তি করার কালে মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে / মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে। তার ভাব ভঙ্গী এবংউচ্চারণরীতি প্রচলিত সাধারণ কথা, বা গান থেকে অনেকপালটে যায়--- যদিও সুরলিপি (স্বরলিপি)-র মতো আবৃত্তির নিজস্ব বিশেষ (েত্রেই সেই বিবিধ সরণ সাধারণ লেখায় ধরার দরকার নেই। তা গান বা কবিতার নিজস্ব বিশেষ(েত্রে। বিশেষ গোষ্ঠীর তা আয়ত্ত। সবাই গান করেন না, বা জানেন না। আবৃত্তি ও তাই। কিন্তু সা(র মানুষের মধ্যে লেখা এবং পড়া একটি সাধারণ ব্যাপার, তই বলার তথা উচ্চারণের ব্যাপারটা লেখার মধ্যে একশ ভাগ ধরতেনা পারলেও চলবে, তা ৯৫ ভাগ ধরলেই হবে। একশ ভাগই ধরা যেত যদি সেই পরিমাণ প্রয়োজনীয় লিপি আমাদের বর্ণমালায় থাকত। সংস্কৃত বর্ণমালা হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বর্ণমালা। বাংলাতে সংস্কৃত বর্ণমালাই গৃহীত হয়েছে। সুতরাং এই অতি সমৃদ্ধ বর্ণমালায়ও যদি বাংলার সব উচ্চারণ ধরা না যায়, অন্যভাষায় তা করা আরও কঠিন। তবে তা ৯৫ ভাগ উচ্চারণমূলক করা যাবে একটু চেষ্টা করলেই। নয়তো। ত্ন ট্র বা ঢন্দ্বন্দ্বজ্জ্রৰ্দ্ধনপ্সত্রপ্ত ট্রপুন্মাড্রন্দ্বৰ্দ্ধ -এর মতো বিস্তৃত বর্ণমালা / লিপিমালা থাকা চাই। কোনও ভাষাতেই সেটা নেই। ঢ ত্ন ট্র একটি কৃত্রিম বর্ণমালা-- বিশেষ সজ্ঞান প্রয়াসে যা নির্মিত হয়েছে। একটি জীবিত এবং ব্যাপকভাবে চালু ভাষায় অত বেশি বর্ণলিপি গ্রহণ করলে তা উলটে ব্যবহারিক সমস্যা তৈরি করবে। তাই যথাসম্ভব অবস্থায় পরিপ্রে(িতে ভাষা ও বানানের সংস্কার করতে হবে। তবে সংস্কারের সবটা একবারে চালু করার চেষ্টা করে ভাষাকে দুর্বোধ্য ও অব্যবহার্য করে লাভ নেই, বরং ধীরে, সুপরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে এগোলে সব দিকটাই সুন্দর ও মসৃণভাবে সামলানো যাবে।

বাংলা বানানে ভুলের সম্ভাবনা ৩১.৭৬ শতাংশ। এর ৮.৬৭ শতাংশই --- ই-ঈ, ি-ী বানানজনিত কারণে ঘটে। এই দুই বর্ণের উচ্চারণ - পার্থক্য বাংলায় নেই। এবং ঈ ধ্বনি বাংলার মৌলিক স্বর - ধ্বনিও নয়। এর উপস্থিতিকেবলমাত্র বানানে দেখা যায়, এবং তা কেবল বিভ্রাটই ঘটায়, উপকারে লাগে না। কি-- অব্যয় এবং ,কী -- সর্বনাম হিসেবে ব্যবহার কেবলমাত্র বানানে সীমাবদ্ধ, এর প্রয়োগ কেবলমাত্র চা(ে। ..কি. লিখে এই পার্থক্য সহজে বোঝানো যায়, এবং তা চা(ে প্রয়োগও হবে। যেমন --- তুমি খাবে কি ঞ্জ এবং তুমি কী খাবে ঞ্জ এখানে প্রথম বাক্যে, তুমি খাবে কিনা, সেই প্র(করা হয়েছে, দ্বিতীয় বাক্যে, তুমি কোন্ জিনিস খাবে, সেই প্র(কররা হয়েছে. এটা এভাবে লেখা যায়---১। তুমি খাবে কি ঞ্জ ২। তুমি কি খাবে ঞ্জ অথবা, ১। তুমি কি, খাবে ঞ্জ ২। তুমি, কি খাবে ঞ্জ এখানে দুই বাক্য দুটি পৃথক অর্থ প্রকাশ করেছে। প্রথম বাক্যে, তুমি খাবে কিনা, এবং দ্বিতীয় বাক্যে তুমি কোন্ জিনিস খাবে, এ প্র(করা হয়েছে। বাক্যের প্রতিবেশ বা স্তুপ্সন্দ্বন্দ্বপ্রন্দ্ব তার অর্থ গ্রহণের প্রকৃষ্ট উপায়। ছোট একটি বা খণ্ডবাক্যে অনেক সময়ে অর্থ স্পষ্ট হয় না।পূর্বাপর না দেখা শব্দের অর্থ অনেক সময়েই স্পষ্ট হয় না। অসভ্য কথাটি খারাপনয়, দু রকম ভাবেই ব্যবহার করা যায়। যারা ঢিল ছুঁড়ছে, সেই বালকদের অসভ্য বলা হয় খারাপ অর্থে, আবার বৌদি দেবরকে ভিন্ন অর্থেও অসভ্য বলতেপারেন।

ঃ এই বিকাশ, বিকাশ। ঠাকুরপো শুনতেপাচ্ছ না ঞ্জ

ঃ না, শুনছি না।

ঃ কেন, কানে কালা হয়ে গেছ নাকি ঞ্জ

ঃ বিকাশ বললে হবে না, বড় হয়ে গেছি না ঞ্জ বিকাশবাবু বলতে হবে।

ঃ অসভ্য ক্ক

বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কারের সবচেয়ে জোরালো--- মৌলিক এবং আমূল সংস্কারের প্রস্তাবটি করা হয়েছিল পূর্ববঙ্গ সরকারি ভাষা কমিটির তরফ থেকে (১৯৪৯)। কিন্তু সেটি কার্যকর হয়নি। সমগ্র প্রস্তাবকে বিভিন্ন পর্যায়ে এবং স্তরে ভাগ করে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করলে তা বাংলা ভাষার এক সার্বিকপরিবর্তন আনতে পারত। কমিটি সম্ভবত সেরকম করে ভাবেননি। একবারেই সমস্ত পরিবর্তনটা আনতে চেয়েছিলেন। সে সকল সুপারিশ একবারে কার্যকর করলে বাংলাভাষাটা হঠাৎ অচেনা হয়ে পড়বে এবং মানুষ তা গ্রহণ করবেন না। এই ভয়ে কমিটির অনেকেই পরে পিছিয়ে আসেন। এছাড়া সে সময়ে পূর্ববঙ্গে উর্দু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয় অনেক তাই এই বানান সংস্কারের পিছনে বাংলা ভাষা ধ্বংসের দুরভিসন্ধি আছে বলে ধরে নেন। ফলে বাংলা ভাষা সংস্কার করার প্রবক্ত(াদের তখন বাংলাভাষার শত্রু--- দুশমন বলে মনে করা হতে থাকে। তাই সে সুপারিশ স্থগিত থাকে। সে সকল সুপারিশ স্থগিত থাকলেও-- তা ছিল খুবই প্রগতিশীল এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। আজ বাংলাদেশে বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠিত। বাংলা সেখানে রাষ্ট্রভাষা। বাংলাভাষার শত্রুরা পরাজিত। তাই সে স্থগিত সুপারিশগুলি নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা দরকার। আজ সে সবের সঠিক মূল্য বোঝা না গেলেও ভবিষ্যতের মানুষেরা বুঝবেন। তখন তাঁরা পিছনপানে তাকিয়ে স্মিত হাস্যে আমাদের দিকে তাকিয়ে এই প্রাচীনদের নির্বোধ ভাববেন।

শি(ার বিস্তার যত ঘটবে -- মূদ্রাযন্ত্র তথা ছাপাখানা, টাইপরাইটার এবং কম্পিউটার - প্রিন্টারের যত প্রসার হবে, বানান সংস্কারের কাজ ততো দিন দিন কঠিন হয়ে উঠবে। এই কারণে যে, মুদ্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে লেখাপড়া ত্র(মে বেশি লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এছাড়া মুদ্রণের মাধ্যমে একই হরফ বিন্যাস বা, গঠন (যুক্ত(বর্ণ ইত্যাদির (েত্রে) বার বার দেখে দেখে তা মনে মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে যায়। সে বিন্যাস বা গঠন যত খারাপ বা অবৈজ্ঞানিক হোক, তখন তাতে অভ্যস্ত বলে, লোকের কাছে সে সবই ভালো লাগে সুতরাং তার সামান্য পরিবর্তনেও লোকে(ৰ্দ্ধচকিত হয়ে ওঠে। কারণ হরফ- পরিচয় ঘটা লোকদের সেসব আবার নতুন করে ভেঙে গড়ে শিখতে হবে যে ক্ক এটাতে আপত্তি উঠবে। নতুন করে পরিশ্রম করতে সবারই অনিচ্ছা থাকা স্বাভাবিক। তবে অনেকে যে সোৎসাহে নতুন পদ্ধতির সমর্থনে এগিয়ে আসবেন এতেও সন্দেহ নেই। বিশেষ করে অল্প শি(িতেরা। বাংলা বানানের অকারণ জটিল জাল ছাড়াতেপারলে তাঁরা খুশিই হবেন।

বানান জটিল থাকায় এবং বানান জটিল করে রাখায় - শি(ার বিস্তারই ব্যাহত হচ্ছে। এবং যথেষ্ট চর্চা না থাকলে অল্পশি(িত, বা নবশি(িতদের ত্র(মে আবার

অন্ধকার ঘিরে ধরবে। সাঁতার জানা থাকলে বা সাইকেল চালাতে জানলে তা সহসা ভোলা যায় না। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয়। নিয়মিত চর্চা না থাকলে দ্রুত সব ভুলতে থাকে মানুষ। একজন উচ্চশি(িত মধ্যবয়স্ক লোক তাঁর স্কুলে পড়া পাঠ আর স্মরণ করতেপারবেন না। বইগুলোর নামই মনে করতে পারবেন না। অথচ হয়তো তিনি ক্লাসে প্রথম হতেন।

ইংরেজি মাধ্যমে পাঠরত এবং বাংলামাধ্যমে পাঠরত দুটি বাংলাভাষী শিশুর মধ্যে যে শিশুটি ইংরেজি মাধ্যমে পাঠরত সে শিশুটি ছয় মাস পরে যে কোনও বাংলা শব্দ বানান করেও পড়তেপারবে। বাংলা মাধ্যমে পাঠরতশিশুটি ছয় মাস পরে কিন্তু যে কোনও বাংলা শব্দ বানান করেও পড়তেপারবে না। সে বানানই করতে পারবে না। এই না -পারার কারণটি কিন্তু শিশুটির অযোগ্যতার জন্য ঘটবে না। ঘটবে ভাষার বর্ণবিন্যাস তথা লিখন পদ্ধদির শ্রেফ জটিলতার কারণে। ইংরেজি শব্দ লেখা হয় হরফ কেবলমাত্র পাশাপাশি বসিয়ে, এবং ইংরেজি লেখার বর্ণবিন্যাস হল একস্তরীয় বা ত্তঙ্গস্ঙ্গব্দনন্দ্বজ্ব, আর বাংলায় আছে যুক্ত(বর্ণ এবং তা ত্রিস্তরীয় বা ও-ব্দনন্দ্বজ্ব, ফলে বাংলা লেখা এবং পড়ার ব্যাপারটা অনেক বেশি কঠিন কাজ। বাংলায় অছে ৫২২ টি যুক্ত(বর্ণ, এর মধ্যে বিশুদ্ধ যুক্ত(বর্ণ ৩৫৫ টি, এবং এর মধ্যে অবিভাজ্য যুক্ত(ধ্বনি হল ৫৪টি। যুক্ত(বর্ণগুলি বাস্তবে এক একটি নতুন হরফ বা বর্ণের মতো, ফলে সকলবর্ণ, সকল স্বরচিহ্(এবং সকল যুক্ত(বর্ণ শেখা শেষ না হলে সকল বাংলা শব্দ পড়া যাবে না, এমনকি তা বানান করেও পড়া যাবে না। অর্থাৎ ইংরেজির জন্য ২৬ (বড় হাত ছোট হাত মিলিয়ে বড়জোর তা ৫২টি) হরফ শিখলেই হয়,অথচ বাংলায় শিখতে হবে মোট স্বরবর্ণ -১১, ব্যঞ্জনবর্ণ - ৪০, স্বরচিহ্(- ১০ বা ফলা - ৮ এবং ধরি প্রায় ৫০০ যুক্ত(বর্ণ। সুতরাং সর্বমোট দাঁড়াল---১১ ৗ ৪০ ৗ ১০ ৗ ৮ ৗ ৫০০ ঞ্চ৫৬৯। এই জটিল বিভ্রান্তিকর অসহনীয় ধুন্ধুমার অবস্থার পরিবর্তন এবং সরলীকরণ কাম্য। বাংলাভাষার গর্বে তাকে জটিল করে রাখা অর্থহীন। বাংলা লেখার পদ্ধতি যদি এমন করা যায় যাতে কেবলমাত্র হরফপরিচয় হলেই যে কোনও বাংলা শব্দ অন্তত বানান করে পড়া যাবে ইংরেজি পড়ুয়া শিশুটির মতো, তাহলে কেমন হয় ঞ্জ তেমন ব্যবস্থা কি অসম্ভব ঞ্জ এরকম হলে বাংলায় প্রাথমিক শি(ায় সময় কম লাগবে আড়াই ছর। দ্বিতীয় শ্রেণী পাশ করলে যে কোনও বাংলা শব্দ শিশুরা অন্তত বানান করে পড়তেপারবে বলে ধরা যায়, কারণ যুক্ত(বর্ণের পাঠ দ্বিতীয় শ্রেণীতে শেষ হয়। প্রাক- প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং দ্বিতীয় শ্রেণী মিলে তিন বছরে বাংলা পড়ায় যে দ(তা তৈরি হয়, ইংরেজি পড়ায় তা হয় ছয় মাসে। বাংলা লেখার পদ্ধতি বা বর্ণবিন্যাসের কারণে এমনটা ঘটে এটা কারও যোগ্যতা বা অযোগ্যতার ব্যাপার নয়। বাংলা এবং ইংরেজি দুটিভাষাই একত্রে শিখছে যে শিশুটি তার (েত্রেও এটা ঘটবে। বাংলাভাষার ব্যাপারটা এমনি এক জটিল জায়গায় পড়েআছে, তা থেকে তাকে তুলে এনে সরল সাবলীল করার চেষ্টা কি আমরা করব না ঞ্জ প্রাথমিক শি(ার পাঠ শেষ করতে বাংলায় আড়াই বছর সময় বেশি লাগে। এটা কমানো সম্ভব। এজন্য বাংলা যুক্ত(বর্ণ লেখার পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক সংস্কার করা দরকার। উপযুক্ত(সংস্কারের পরে, সদ্য বর্ণপরিচয় হওয়া ছয় মাস প্রাথমিক শি(া নেওয়া শি(ার্থী যে কোনও বাংলা শব্দ (অন্তত বানান করে) পড়তেপারবে। এজন্য যুক্ত(বর্ণ গঠনের সূত্র হবে---১। দুই বর্ণে স্তু১ স্তু১ তিনবর্ণে স্তু১ স্তু২, সং(েপে ১। স্তু১ স্তু২ -লপ ঞ্চগল্প, ২। স্তু১ স্তু১২ --জ জ ব ঞ্চউজজবল।

এই ধরনের কয়েকটি মৌলিক সংস্কার কাজ করার পরে বাংলা লেখা, এবং পড়া হবে খুবই সহজ সরল এবং আনন্দদায়ক। মনে আনন্দ, প্রাণের আরাম। তখন বানান আর মুখস্থ রাখতে হবে না। যেমন যেমন বলা হবে তেমন তেমন লিখে ফেললেই হবে। তখন আর বানান ভুল হবে না। বানান ভুল করা যাবে না।

তবে সংস্কার প্রচেষ্টার সব সূত্র নিয়ে একবার নেমে পড়লে হবে না। ধীরে ধীরে একটু একটু করে সইয়ে এগোতে হবে। এজন্য বাংলা বানানে আপাতত একটাই মাত্র সংস্কার করা হোক প্রথম পদ(েপ হিসেবে। অঅর তাতেই বানান ভুলের সম্ভাবনা কমবে ৮.৬৭ শতাংশ, অর্থাৎ মোট ভুলের প্রায় এক- তৃতীয়াংশ (৮.৬৭/৩১.৭৬ ঞ্চ২৭.৩ শতাংশ) কমবে। বাংলায় ই, ঈ এই ধ্বনি দুটির পৃথক অস্তিত্ব নেই। মৌলিক স্বরধ্বনি হিসেবে অস্তিত্ব আছে ..ই.. ধ্বনির। ভাষা বিজ্ঞানীদের এই অভিমত মেনে বাংলায় কেবলমাত্র .. ই.. স্বরধ্বনির বর্ণ ব্যবহার করা হবে, এবহএর স্বরচিহ্(টি বজায় থাকবে। ঈ-বর্ণ এবহ তার স্বরচিহ্(বাতিল হবে। তহলে বানান তথা শব্দ লিখতে গিয়ে বিজিগীষা, বিভীষিকায় আটকে যেতে হবে না। অনায়াসে বিজিগিষা, বিভিষিকা লেখা যাবে। এজন্য অভিধানের দ্বারস্থ হতে হবে না, এবং এ(েত্রে বানান ভুল করা যাবে না। লিখলেই হল। সর্বত্র ই এবং ই-কার (ন্দ্র) হবে। যাহোক, অধিক ব্যবহারিক সুবিধার জন্য ই-কার চিহ্(হিসেবে ব্যবহার করা হবে .ী.. চিহ্(, অর্থাৎ ি- চিহ্নে(র বদলে ী, ইঞ্ঝী। হাতে করে লেখায়, টাইপ করতে, কম্পিউটার কি- বোর্ড দিয়ে কম্পোজ করতে এতে সুবিধা হবে। তাই নীতি রীতি, দীধিতি ইত্যাদি লেখা হবে--- নীতি, রীতি দীধীতী, বীজগীষা, বীভীষীকা ইত্যাদি। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হাতে করে লেখার সুবিধার কারণে ..ী.. চিহ্(পছন্দ করতেন।

বানান সংস্কারের প্রচেষ্টা হিসেবে এই একটি মাত্র (েত্রে পরিবর্তন আনলেই মানুষ অনেকদিন স্বস্তি পাবেন। এসকল শব্দ লেখার কালে মানসিক উদ্বেগ (টেনশন) আর বিন্দুমাত্র থাকবে না। নচেৎ এ সকল শব্দ অভিধান নাদেখে সঠিক লেখা গুটিকয় বিশেষজ্ঞের প(েই সম্ভব। ভাষাকে ততোখানি সংকুচিত করে রাখার কোনও সঠিক যুক্তি(নেই। ভাষা সহজ সরল হলে মানুষ তড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখে এগিয়ে যাবে, দেশ ও জাতির উন্নতি হবে। যে - ভাষায় জটিলতা বেশি, সে - ভাষার মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ভাষার কারণে কিছুটা পিছিয়ে থাকবে। নানা জাতি এখন সড়ক, রেল, বিমান, টেলিফোন ইত্যাদি সহজ যোগাযোগের ফলে অনেক কাছাকাছি। সারাদেশ এখন একটা পরিবার, এবং সারা বি(্ব একটা গ্রাম মাত্র। যার ভাষা বেশি সহজ সরল তার অগ্রগতি দ্রুত হবে এতো সহজ কথা। তাই দেশে এবং বি(্বে অন্যদের তুলনায় কেবলমাত্র ভাষার কারণে পিছিয়ে পড়তে না চাইলে ভাষাকে সহজ সরল করে গড়ে তুলতে হবে। ভাষাকে জটিল করে রাখায় একটা অকারণ আত্মপ্রসাদ লাভ হতেপারে--- তবে সেটা লাভ নয়, লোকসান ক্ক

পৃথক পৃথক শব্দ ধরে বানান সংস্কার করার উদ্যোগ এখন অবধি সকল বানান - সংস্কার প্রচেষ্টায় নেওয়া হয়েছে। এই চেষ্টাটা হাস্যকর এবং অফলপ্রসূ। চর্মরোগের জন্য শরীরের হাজার ফোঁড়ায় প্রত্যেকটিতে পুলটিস না লাগিয়ে --- এ(েত্রে ওষুধ খেয়ে সবকটি ফোঁড়া একত্রে সারানো দরকার। অর্থাৎ রোগের আভ্যন্তরীণ কারণ দূর করাদরকার। যেখানে যেখানে স্ফোটক জাগবে সেখানে সেখানে এত ওষুধ লাগানোর চেষ্টা ভ্রান্ত চেষ্টা। গীতি, ভীতি বানানে গিতী, ভিতী এড়াবার পথ হল ..ই.. ধ্বনির দু-দুটো চিহ্(না রেখে, এক- ধ্বনি, এক- চিহ্(নীতি মেনে কেবদল ..ই.. - বর্ণ এবং ই-কার (ন্দ্র) চিহ্(রাখা। তখন গিতি ভিতি লেখায় কোনও কারণেই আর ভুল হবে না।

ব্যবহারিক সুবিধার জন্য গীতী, ভীতী লেখা হবে। এতে ছাপার জন্য কম্পোজ করতে, টাইপারইটারে টাইপ করতে এবং হাতে করে লেখায় অনেকটা সুবিধা বাড়বে। তখন ই-ধ্বনির বানানে আর ভুলের স্ফোটক দেখা দেবে না। এ(েত্রে---অমুক শব্দের বানান এই হবে, তমুক শব্দের বানান ঐ হবে--- এমন ফরমান জারি করতে হবে না।আর ক্লেশকর সেসব বানান মনে রেখে মাথা ভারী করার দরকারও হবে না। মূল বিষয়টিতে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে সংশ্লিষ্ট সকল শব্দের বানান আপনিই নিয়ন্ত্রিত হবে। এই মূল জায়গাতেই কেউ হাত দেননি, দিতে চাইছেনওনা, ফলে নতুন নতুন নিয়মের জালে পড়ে বাংলা বানান দিনে দিনে আরও বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠেছে।

ভাববাদী লোকেরা--বিশেষ করে কবিরা, এবং অন্যদিকে হিসেবী লোকেরা জানতে চাইবেন সত্যিই কি বাংলায় ..ঈ.. নেই ঞ্জ ঈ-বাতিল করলে ব্যবহারিক কারণে লাভ কতটা এবং লোকসানই-বা কতটা ঞ্জ ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন বাংলায় .. ই .. হল মৌলিক স্বরধ্বনি। সাধারণ বাংলাভাষীরা -- শি(িত, উচ্চশি(িত, অশি(িত কেউই .. ঈ ..-এর অস্তিত্ব অনুভব করেন না। কেবল বানানে . ঈ . হরফটি বজায় রেখে লোককে ঈ-ধ্বনি অনুভব করানো কঠিন। যার ধ্বনি আসলে নেই তা লোককে কেমন করে অনুভব করানো যাবে ঞ্জ (মিষ্টি নয় তবু তাকে শুনে বুঝতে হবে যে সেটা মিষ্টি ক্ক) অথচ যেসকল ধ্বনি বাংলায় আছে তেমন একটি মৌলিক স্বরধ্বনি .. এ্যা .. ---এর লিপি কিন্তু বাংলায় নেই। অকারণ সংস্কার - বদ্ধ হয়ে চলায় আমাদের সত্যিকারের লাভ কিছু হচ্ছে না। ধরি যদি লাভপাঁচ শতাংশ হয়ও -এর জন্য লোকসান হচ্ছে পঁচানব্বই শতাংশ। অতি কষ্টে বিশেষ কোনও একটি জায়গায় যদি কবিরা মানুষকে ঈ-ধ্বনির অস্তিত্ব বোঝাতেপারেন, তাতে অন্য হাজার হাজার জায়গায় যে চরম বিভ্রান্তি চলতে, বানান ভুল হচ্ছে--- তা ঠেকানো যাবে না। একেই বলে বোধহয়, যারা আছে তাদের হেলাফেলা, দেখা নেই যার তার

যোল কলা ক্ষ ভাববাদী .. ঈ .. বাতিল করে দিয়ে যদি বাস্তব লাভ অনেকখানি হয়, তবে এযুগে বসে, তা থেকে পিছিয়ে থাকার অর্থ হল--- স্বেচ্ছায় চেষ্টা করে পিছিয়ে পড়া, এবং পিছিয়ে থাকা। কবিরা দুচারজনে ভাববাদী হয়ে তেমন করতে চাইলেও সাধারণ মানুষ, ১৯ কোটি বাংলাভাষী-- নির(র বাংলাভাষী, তা চান না। এই ১৯ কোটির মোটে সাড়ে সাতকোটি হয়ত মোটামুটি শি(িত (৪০ শতাংশ ধরে), বাকি সাড়ে এগারো কোটি কি একুশে ফেব্রুয়ারির সুফল পাবেননা ঞ তাঁরা কি তাঁদের নিজেদের ভাষার অকারণ জটিলতার জন্যই পিছিয়ে পড়বেন, শি(া - বঞ্চিত থাকবেন ঞ

যুক্তি(র কথা আমরা যতই বলি, বি(াসে প্রায়ই তা মেনে নিতে পারি না। ছেলেবেলায় দুষ্টুমিকে সংযত করার জন্য বড়রা যে ভূতের ভয় দেখাতেন, বড় হয়ে যুক্তি(বুদ্ধির সাহায্যে যখন নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ভূত বলে কিছু নেই, তখনও কিন্তু মনে গভীরে প্রোথিত বি(াস থেকে তাই তা তাড়ানো কঠিন। তেমনি বাংলা বানান সহজ সরলকরার কথা যুক্তি(র পথে মেনে নিলেও সংস্কারের বদ্ধ ধারণা থেকে আসবে। যদিও সে বাধা আর খুব বেশি দিন টিকবে না। দুরন্ত গতির যুগে, কম্পিুটারের যুগে ভাষার অনাবশ্যক অহেতুকে জটিলতার কারণে পিছিয়ে থাকলে, অন্য সবাই প্রবল বেগে ঠেলে, গায়ের উপর দিয়ে হুড়মুড় করে এগিয়ে চলে যাবে। আমরা বানানের ভাববাদের বাহানা নিয়ে বসেথেকে তা কি কেবল দেখব ঞ সময় থাকতে কি নড়ে চড়ে বসব না ঞ পি - পু ফি - শু (পিঠ পোড়ে, ফিরে শো) করলে পুড়েই মতে হবে। মরার পরে আর আত্মবিশ্লেষণের দরকার হবে না।

বাংলা বানানে স্থিতাবস্থার পরী(া অতি দীর্ঘকাল হয়েছে, আর নয়। বাংলাভাষা বীজটির সঠিকপরিচর্যা করলে সে মহী(হ হবে, ভুবন ব্যেপে যাবে। কেবল বাংলা বানানে এখন চাই মুক্ত(বায়ু, চাই গতির অভিষেক। গতিই হল ভাষার প্রাণচিহ্ন(। আর বানান হল ভাষার প্রাণ। সেই বানানকে সহজ সরল গতিশীল করলে ভাষা প্রাণবান হবে, ভাষা গতিশীল হবে। লিখবার কালে, বানান কী হবে, তা ভাবতেই যদি চিন্তাশক্তি(র এবং মনোযোগের অনেকখানি ব্যয় হয়, তবে মৌলিক ভাবনা চিন্তা অনেকটা (তিগ্রস্ত হয়। তার প্রতিকার করতে, বাংলা ভাষার লেখার মধ্যে মৌলিক এবং উন্নত চিন্তাশক্তি(যাতে ব্যাহত না হয় সে জন্য সরল বানান অবশ্যই চাই। বানানে জটিলতা কুটিলতা বজায় রাখা ভাষা ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য নয়, ল(্য নয়। ভাষাকে তার সঠিক কাজে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য বানানের বিভ্রান্ত বিন্যাস বন্ধ করে তাকে সহজ করা চাই। এ কাজ আধুনিক এবং প্রগতিচিন্তার মানুষেরা করতেপারেন। সাহসের সঙ্গে তাঁদের এ কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।